গৌতম নিয়োগী

বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের একমাত্র 'সেকুলার' চরিত্র

বিদ্যাসাগরের কথা অমৃত সমান। বাঙালি যত শোনে ততই পুণ্যবান হয়ে ওঠে। তিনি যতই নিত্যস্মরণীয় এবং প্রণম্য হোন, যতই পৌরুষ-দীপ্ত এবং তেজস্বী হোন, যত বড়ো কর্মবীর ও পণ্ডিতই তিনি হোন না কেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁর ব্যতিক্রমী ঋজু চরিত্র তাঁকে অনন্য করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি। উনিশ শতকে যত মনীষী জন্মেছেন, কিংবা উনিশ শতকে জন্ম নিয়ে বিংশ শতকে দেহ রেখেছেন অথবা আঠারো শতকে জাত হলেও উনিশ শতকে প্রয়াত হয়েছেন, তাঁর মধ্যে একান্ত ব্যতিক্রমী হয়ে বিদ্যাসাগর একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম বিষয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। তার চাইতেও বড়ো কথা, তাঁর আগ্রহের এবং বিবেচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু মানুষ, ভগবান কখনওই নয়। এই মানবমুখী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তিনি আধুনিক।

অবশ্য বিপরীতে এমন একটা বক্তব্য হয়তো কেউ তুলতে পারেন, তাহলে কি যাঁরা ধর্ম বা ঈশ্বর বিষয়ে গভীরভাবে ভাবিত ছিলেন বা সংস্কারকর্মে ব্রতী ছিলেন বা ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা তুলে ধরতে চেয়েছেন তারা আধুনিক? না, এমন অদ্ভুত যুক্তি আমাদের নেই। আমাদের দেশে যিনি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, যুক্তিহীন ঐতিহ্য ও লোকাচারের লৌহকপাটে ধাক্কা দিয়ে বাঙালির মননকে আধুনিকতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই রামমোহন রায় তো প্রবলভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। আবার রামমোহনের প্রয়াণের (১৮৩৩ খ্রি.) উনসত্তর বছর পরে যিনি অকালপ্রয়াত (১৯০২) সেই বিবেকানন্দ স্বামীও তো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তিনিও তো আধুনিক। তবে ধর্মের নামে যাঁরা রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, সেই পশ্চাদ্‌মার্গী পুনরুত্থানবাদীরা অবশ্যই আধুনিক নন। আমাদের এটি মূল আলোচ্য না। তাই বিস্তারিত বিশ্লেষণ-বিচারে যাচ্ছি না, শুধু এটুকু বলা যেতে পারে ঐতিহ্য বনাম আধুনিকতা সবসময় তক্‌মা এঁটে আলাদা করা যায় না।

আমরা বলছিলাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যতিক্রমী চরিত্রের কথা। তাঁর মানসিকতাই মানবকেন্দ্রিক। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম ও ঈশ্বরের গুরুত্ব সেখানে কম। এখানেই উঠে আসে অনিবার্য সত্য। তিনি উনিশ শতকের একমাত্র 'সেকুলার' চরিত্র। ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার মনোভাবের তিনটি শর্ত বিদ্যাসাগর মশাই উনিশ শতকেই পূরণ করে গিয়েছেন। প্রথমত, বিদ্যাসাগরের প্রথম এবং প্রধান বিবেচ্য মানুষ। কোন মানুষ? যিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের বিভেদকে অতিক্রম করে কেবল মনুষ্যত্বের পরিচয়েই নিজেকে পরিচিত করে। দ্বিতীয়ত, তিনি ব্যক্তির ধর্মকে সম্প্রদায়ের ধর্মের সঙ্গে একাকার করে ফেলেন নি। তাঁর চেতনায় ধর্ম বা ঈশ্বরের স্থান যাই হোক না কেন, ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসকে যে তিনি ব্যক্তিগত স্তরে আবদ্ধ রাখায় বিশ্বাসী ছিলেন, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ধর্মবিশ্বাসকে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে তিনি যে ব্যক্তিজীবনের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন, ধর্মকে

সামাজিক স্বার্থসিদ্ধি বা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার তো প্রশ্নই নেই। এই অভিপ্রায়ের মধ্যেই রয়েছে আধুনিকতার গণতান্ত্রিকতার সঙ্গে সেকুলারইজমের শর্ত। তৃতীয়ত, তাঁর ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু ধর্মমত ও ঈশ্বরবিশ্বাস তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখে সেকুলার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই তো তাঁর মত ও বিশ্বাস সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পারছি না। তবে এ-বিষয়েও কোনও সন্দেহ বা সংশয় নেই ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে বিশেষ সম্প্রদায়কে তোষণ বা ধর্মনিরপেক্ষ হতে গিয়ে ধর্ম সম্পর্কে অবজ্ঞা যেমন তিনি করেন নি, তেমনি ধর্ম বর্জন করতেও বলেন নি, কোনও ধর্মকে আঘাতও করেন নি। তিনি শুধু ধর্মব্যবসা বা ধর্মের নামে কায়েমী স্বার্থ বা সামাজিক রীতির নামে অ-মানবিকতাকেই তীব্র আক্রমণ করেছেন। তাই তিনি সব দিক বিবেচনায় মানবতাবাদী কর্মিষ্ঠ যেমন, সেকুলারও তেমনি।

২.

বিদ্যাসাগরের কথা নতুন করে বলা কঠিন। সবই তো বলা হয়ে গেছে। আর পুনরাবৃত্তি বা চর্বিত-চর্বণে এই বয়সে মন সায় দেয় না। চল্লিশ বছরের বেশি উনিশ শতকচর্চার পর আমাদের এখনও দৃঢ় মত বিদ্যাসাগর চর্চা হতেই পারে। তা চলতে থাকুক। হয়তো ভবিষ্যতে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসতে পারে কোনও সূত্র থেকে। বিদ্যাসাগরচর্চারও দীর্ঘ ইতিহাস।

বিদ্যাসাগরের বহু সুনিশ্চিত জীবনী আছে : অন্তত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,[১] বিহারীলাল সরকার[২] এবং শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন[৩]-এর লেখা অত্যন্ত মূল্যবান। আধুনিক যুগে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন বিনয় ঘোষ।[৪] তবে আমাদের বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধুনিক বিদ্যাসাগর-জীবন-কথা অবশ্যই ইন্দ্র মিত্রের (অরবিন্দ গুহ) *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*।[৪] অল্পকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনবদ্য ভাষায় ধরে রেখেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বিদ্যাসাগরচরিত* রচনায়।[৬] কাছাকাছি রাখব রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনা।[৭] ইংরেজিতে বিদ্যাসাগর-জীবনী লিখেছেন শ্রীচরণ চক্রবর্তী[৮] এবং সুবলচন্দ্র মিত্র।[৯] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত জীবনী লিখেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[১০] নির্ভরযোগ্য কাজ।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্মৃতিমূলক লেখাও কম না। শিবনাথ শাস্ত্রী, ক্ষুদিরাম বসু, শশিভূষণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরৎকুমার লাহিড়ী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রজনীকান্ত গুপ্ত, যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।[১১] আর আধুনিক যুগের লেখক-পণ্ডিত-গবেষকদের কথা তুলছিই না। তাঁর বহুমুখী কর্মধারা নিয়ে এত বেশি-বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা হয়েছে যে তার হদিশ দিতে গেলে সাতকাহন হয়ে যাবে, তার প্রয়োজনও নেই। প্রায় প্রত্যেকদিকই যে যাঁর মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাই বলছিলাম বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নতুন কথা বলা কঠিন।

বিদ্যাসাগরের ধর্মমত নিয়েও নানা কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু বিদ্যাসাগর চরিত্রের সেকুলার দিক নিয়ে আলোচনা খুবই কম। একমাত্র অমিয়কুমার সামন্ত একটি সুলিখিত রচনা ছাড়া কারও লেখা এই বিষয়ে অন্য লেখা আমাদের চোখে পড়েনি।[১২] তাই আমাদের বর্তমান আলোচনা। তথ্য ও যুক্তি সাজিয়ে দেওয়া হলো, সিদ্ধান্তও আমাদের তবে তা গ্রহণ বা বর্জনের ভার পাঠক-পাঠিকাদের।

এমন একটা ধারণা সাধারণের মধ্যে অনেকেরই আছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশ্বর বা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হলেও অবশ্য ধার্মিক হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম সহ পৃথিবীর অনেক ধর্ম আছে যেখানে ঈশ্বর নেই। আবার হিন্দুধর্ম (বস্তুত এই নামে আদতে প্রাচীন যুগে কোনও ধর্ম ছিল না, পরে তার সৃষ্টি। এই সূত্রটি আমাদের মূল আলোচ্য না, তাই অলমতিবিস্তারেণ।) খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ইত্যাদি ঈশ্বর-বিশ্বাসী। বিদ্যাসাগর আদৌ ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না এমন বলা হয়েছে। আবার, বিপরীতে, অনেক লেখক দেখবার চেষ্টা করেছেন বিদ্যাসাগরকে ধর্মবিশ্বাসী প্রমাণ করতে।

বিদ্যাসাগর 'নাস্তিক' ছিলেন, এ-কথাটি প্রথম জোর দিয়ে বলেছিলেন অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। একথা সুবিদিত যে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন :[১৩]

> বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা বোধহয় তোমার জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে কথা লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুজ্জের সহিত পরলোকতত্ত্ব লইয়া হাস্যপরিহাস করিতেন; ললিত সে সময় যেন কতকটা যোগসাধন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এইরূপ লোকে বলাবলি করিত।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সত্যিই কি নাস্তিক? বিপিনবিহারী গুপ্ত যিনি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনিই আবার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কথাট জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন অনেক খাঁটি কথা।[১৪]

> "বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন? উত্তর হইল, 'ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী।"

এখানে একটি তত্ত্বগত প্রশ্ন তোলা জরুরি। আস্তিক বা নাস্তিক দুটি শব্দই কিন্তু ইতিবাচক। অর্থাৎ যিনি আস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী তিনি ইতিবাচক ভাবেই বিশ্বাস করেন তিনি আস্তিক (theist)। এই বিশ্বাসের পিছনে প্রমাণ থাক না থাক তিনি মানেন ঈশ্বর আছেন। অন্যদিকে যিনি নাস্তিক্যদর্শনে বিশ্বাসী তিনিও ইতিবাচকভাবেই বিশ্বাস করেন তিনি নাস্তিক (Athist)। ঈশ্বর যে নেই তার প্রমাণ থাক বা না থাক। এটি পৃথিবীর যে-কোনও ভূখণ্ডে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে আবার কিছু হিন্দু গোষ্ঠী আছেন যারা বিশ্বাস করেন আপনি যদি বেদের অভ্রান্ততায় (Infallibility of the Vedas) বিশ্বাস না করেন, তাহলেও আপনি নাস্তিক। বলা বাহুল্য এই যুক্তি ধোপে টেঁকে না। তৃতীয়ত, যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সূত্র তা হলো আপনি ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা নিয়ে মাথাই ঘামান না, নেইও বলেন না, আছেনও বলেন না। তাহলে আপনি অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic)।

আমাদের বিবেচনায় বিদ্যাসাগরকে আস্তিক বা নাস্তিক কোনও পক্ষেই রাখা কঠিন। তাই 'অজ্ঞেয়বাদী' বলা ভুল না। যদিও ব্রাহ্ম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আস্তিক্যবাদী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে অজ্ঞেয়বাদী বলেও নাস্তিকের বন্ধনীর মধ্যেই ঠেলে দিয়েছেন। ভুললে চলবে না,

অজ্ঞেয়বাদী বললে যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না, তেমনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসও বোঝায় না। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বসুও লিখেছেন[১৫] :

> তাঁর (বিদ্যাসাগরের) ধর্ম্মজীবন-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাঁর ধর্ম্মজীবন কর্ম্মগত ছিল। কাজই তাঁর কাছে ধর্ম্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। কিন্তু তিনি প্রথম বই লেখেন—'বাসুদেবচরিত'। প্রতিমা পূজা তিনি লৌকিকভাবেই দেখতেন। কেন না বাড়ীতে ত কোন পূজা হ'তে দেখি নি। মোটের উপর মনে হয় তিনি Agnostic (সংশয়বাদী) ছিলেন।

সংশয়বাদী অবশ্যই কিন্তু সংশয়বাদী আর একেশ্বরবাদী (Unitarian) সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষুদিরাম বসু অবশ্যই সঠিক যে কর্মই বিদ্যাসাগরের কাছে ধর্ম। তাঁর বাড়িতে কোনও গৃহীর পাট নেই। ওই রচনাতেই ক্ষুদিরাম বসু আরও লিখেছেন[১৬] :

> অনেকদিন এমন কেটেছে যে বিকেল থেকে ঠায় ঘরে বসে গল্পগুজব হ'তে হ'তে রাত হ'য়ে গেছে। সেইখানেই খাবারটাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে ত দেখিনি।

সুতরাং *বোধোদয়* বইতে ছাত্রপাঠ্য রচনায় তিনি 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' বাক্যটি দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত করলেও, তা তাঁর মনের কথা হলেও (বা না হলেও) জীবনের আচরণে তিনি পূজাআর্চা করেননি, জপ-সন্ধ্যাও করেন নি। এমন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অবশ্যই অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী। অমিয়কুমার সামন্ত তা মন্তব্য করেছেন সঠিকভাবেই[১৭] :

> সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলাও যেমন দুরূহ, তেমনি তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বললে অবধারিতভাবে সত্যের অপলাপ হবে। তিনি অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী ছিলেন—এইটিই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সত্যের সব থেকে কাছাকাছি।

আমাদেরও হুবহু তাই মত।

৪.

বিদ্যাসাগর ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে মাথা বিশেষ ঘামাননি, ব্যক্তিগত আচরণেও তা স্পষ্ট তবু তাঁকে নাস্তিক বলা যেমন চলে না, তেমনি একথাও সত্য তিনি নিজে কখনও নিজেকে নাস্তিক বলেন নি। আবার অনেকে যেমন তাকে ধর্মবিশ্বাসী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে তাও ভ্রান্ত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে না গিয়েও কিছু তথ্য পেশ করা দরকার। এই বিতর্ক বহুদিনের। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন[১৮] :

> ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাস টলিল। চিরঘোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন। বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বন্যায় ভেসে যাননি। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র নন। ডিরোজিয়ান নব্যবঙ্গভুক্ত নন। তিনি মনে প্রাণে আধুনিক হলেও ধ্রুপদী সাহিত্য, দর্শন, ভাষায় সুপণ্ডিত আবার স্বভাবে ইংরেজ, যুক্তিবাদী। স্বাভাবিকভাবেই

অজ্ঞেয়বাদী বললে যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস না, তেমনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসও বোঝায় না। অধ্যাপক ক্ষুদিরাম বসুও লিখেছেন[১৫] :

> তাঁর (বিদ্যাসাগরের) ধর্ম্মজীবন-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাঁর ধর্ম্মজীবন কর্ম্মগত ছিল। কাজই তাঁর কাছে ধর্ম্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। কিন্তু তিনি প্রথম বই লেখেন—'বাসুদেবচরিত'। প্রতিমা পূজা তিনি লৌকিকভাবেই দেখতেন। কেন না বাড়ীতে ত কোন পূজা হ'তে দেখি নি। মোটের উপর মনে হয় তিনি Agnostic (সংশয়বাদী) ছিলেন।

সংশয়বাদী অবশ্যই কিন্তু সংশয়বাদী আর একেশ্বরবাদী (Unitarian) সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষুদিরাম বসু অবশ্যই সঠিক যে কর্মই বিদ্যাসাগরের কাছে ধর্ম। তাঁর বাড়িতে কোনও গৃহীর পাট নেই। ওই রচনাতেই ক্ষুদিরাম বসু আরও লিখেছেন[১৬] :

> অনেকদিন এমন কেটেছে যে বিকেল থেকে ঠায় ঘরে বসে গল্পগুজব হ'তে হ'তে রাত হ'য়ে গেছে। সেইখানেই খাবারটাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে ত দেখিনি।

সুতরাং *বোধোদয়* বইতে ছাত্রপাঠ্য রচনায় তিনি 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' বাক্যটি দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত করলেও, তা তাঁর মনের কথা হলেও (বা না হলেও) জীবনের আচরণে তিনি পূজাআর্চা করেননি, জপ-সন্ধ্যাও করেন নি। এমন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অবশ্যই অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী। অমিয়কুমার সামন্ত তা মন্তব্য করেছেন সঠিকভাবেই[১৭] :

> সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলাও যেমন দুরূহ, তেমনি তাঁকে ঈশ্বরবিশ্বাসী বললে অবধারিতভাবে সত্যের অপলাপ হবে। তিনি অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী ছিলেন—এইটিই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সত্যের সব থেকে কাছাকাছি।

আমাদেরও হুবহু তাই মত।

৪.

বিদ্যাসাগর ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে মাথা বিশেষ ঘামাননি, ব্যক্তিগত আচরণেও তা স্পষ্ট তবু তাঁকে নাস্তিক বলা যেমন চলে না, তেমনি একথাও সত্য তিনি নিজে কখনও নিজেকে নাস্তিক বলেন নি। আবার অনেকে যেমন তাকে ধর্মবিশ্বাসী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে তাও ভ্রান্ত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাতে না গিয়েও কিছু তথ্য পেশ করা দরকার। এই বিতর্ক বহুদিনের। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন[১৮] :

> ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি প্রবর্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এদেশীয় ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাস টলিল। চিরঘোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

কিন্তু এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন। বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বন্যায় ভেসে যাননি। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র নন। ডিরোজিয়ান নব্যবঙ্গভুক্ত নন। তিনি মনে প্রাণে আধুনিক হলেও ধ্রুপদী সাহিত্য, দর্শন, ভাষায় সুপণ্ডিত আবার স্বভাবে ইংরেজ, যুক্তিবাদী। স্বাভাবিকভাবেই

চলেননি বলে কঠোর সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি। "হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না।" এমন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেছেন বিহারীলাল। [২৪] নিজের উইলে দেবদেবীর সেবার জন্য কোনও অর্থসংস্থানের বরাদ্দ রাখেন নি বিদ্যাসাগর। তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবিক, তাতে চটে গিয়ে বিহারীলালের মন্তব্য : 'উহাতেও বিদ্যাসাগরের মতিগতির পরিচয়।"[২৫]

আসলে যে যাঁর নিজের মতো করে বিদ্যাসাগরকে বুঝেছেন। ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের সুসম্পর্ক কিন্তু ব্রহ্মোপাসনায় তাঁর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। আবার শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি একদা বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান স্কুলের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের শিক্ষক ছিলেন এবং কর্তব্য অবহেলার কারণে বিদ্যাসাগর তাকে কর্মচ্যুত করেন। তিনি *রামকৃষ্ণ কথামৃত* গ্রন্থে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। শ্রীম একদিন বিদ্যাসাগরের বেত খাওয়ার গল্পোটি শুধিয়েছিলেন বিবেকানন্দকে। 'নিজেই সামলাতে পারি না। আবার পরের জন্য বেত খাওয়া' ইত্যাদি বলেন বিদ্যাসাগর। অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মনে করতেন, আমি নিজেই ধর্ম বা ঈশ্বর বিষয়ে কিছু বুঝি না, তা পরকে কি বোঝাব। উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ তা মানলেন না। বিবেকানন্দের কথা : যে ঈশ্বর বোঝে না, সে দয়া, পরোপকার, বিদ্যাদান, স্কুল গঠন ইত্যাদি বুঝল কী করে? "যে একটা বোঝে সে সব বোঝে।"[২৬]

রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) যিনি 'যত মত তত পথ'-এর উদ্গাতা তিনি নিজে গিয়েছেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট, সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনেক সুন্দর সুন্দর কথাবার্তা হলো, দুজনের প্রশংসা দুজনে করলেন কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের ধর্মব্যাখ্যায় আদৌ প্রভাবিত হননি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সংশয়ী চিত্তের পরিচয় পেয়ে রামকৃষ্ণ বলেন, "তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাণ্ডিত্য দ্বারা পাওয়া যায় না।" রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে রাসমণির বাগানে বিদ্যাসাগরকে যেতে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন কিন্তু বিদ্যাসাগর কখনও রামকৃষ্ণের কাছে যাননি। এজন্য রামকৃষ্ণ অনুযোগও করেছেন। তা না হয় হলো, কিন্তু রূঢ় এবং কিছু অশোভন কথা তিনি বলেছেন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যা আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। দুটি উদাহরণ। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন তিনি বলেন : "বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলে ফেললে, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন? কি জানো, জালে প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে। রুই কাতলা। তারপর জেলে পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়। তখন চুনোপুঁটি-পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?"[২৭]

অথবা, "বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা-রূপা আছে। যদি সে সোনার সন্ধান পেতো, এতো বাইরের কাজ যা করবে তাতে কম পড়ে যেতো, শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেতো।"[২৮] একথা বলেছেন ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুলাই। বলা বাহুল্য, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে দুই মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন।

আসলে বিদ্যাসাগরের প্রথম জীবনীকার এবং তাঁর নিজের তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর বই দেখিয়েছেন যে বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র ধর্ম ও ধর্মীয় আচার সম্পর্কে উদাসীন। বিদ্যাসাগরের মতে নানামুনির নানা মতো, 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'। তাই ধর্ম নিয়ে তর্ক

কখনও মীমাংসা হবে না।[২৯] বিদ্যাসাগর কিন্তু নিজে পুজোআর্চা না করলেও, মন্দিরে উপাসনায় অংশ না নিলেও মন্ত্রোচ্চারণ না করলেও আত্মীয়-পরিজন-বান্ধবদের ব্যক্তিগত ধর্মাচরণে বাধা দেননি বা বিরূপ মন্তব্য করেননি।[৩০] এইখানেই তিনি সেকুলার মনোভাবাপন্ন।

আসলে বিদ্যাসাগরের কাছে বাবা-মা সাক্ষাৎ ভগবান। তবে বাবার চেয়ে মায়ের প্রভাব অনেক বেশি। মনে রাখা দরকার ভগবতী দেবী রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন না। পৌত্তলিকতায় তাঁর সায় ছিল না। একবার বেনারসে একদল হিন্দু ব্রাহ্মণকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের কালী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।" এই সাক্ষ্য দিয়েছেন শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বয়ং।[৩১] সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দুই উর্দ্ধ কমার মধ্যে 'ধর্মবিশ্বাসী' বলা কঠিন।

৫.

এখন আমরা তাঁর মৃত্যুর একশো বছরের বেশি সময় পার করে, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সেকুলার বলতে প্রকৃতপক্ষে (মেকী বা ছদ্ম সেকুলারও অনেক আছেন) যা বুঝি বিদ্যাসাগর মশাই উনিশ শতকেই ছিলেন তাই। যদি তাঁর ধর্মমত কিছু থাকেও, পক্ষে-বিপক্ষে যাই হোক্, তা ব্যক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি নিজের চেতনাকে সম্প্রদায়ের চেতনার সঙ্গে একাকার করে দেননি। এ-বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য[৩২] :

> দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধকরি, সেইজন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্তব্যপথে চালাইত। তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।

তা বলে নিজের কর্তব্য তিনি অবহেলা করেন নি। তিনি *বোধোদয়*-এ 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' লিখলে কি হবে, সাংখ্য বা বেদান্ত দর্শনকে 'false systems of philosophy' বলতে তিনি ছাড়েন নি।[৩৩] সে যুগে এমন মন্তব্য অবশ্যই বৈপ্লবিক। একমাত্র সেকুলার মননের পক্ষেই এমন উক্তি করা সম্ভব।

ইন্দ্র মিত্র তাঁর *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* বইতে (২য় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০৬, পৃ: ৫৭৬) লিখেছেন : "১৮৭৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ফন্ডের ডিরেক্টরদের কাছে বিদ্যাসাগর একখানা চিঠিতে লিখেছেন : 'এই ফন্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফন্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।" তারপর লেখক মন্তব্য করেছেন : "ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির ভয়! ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির কথা এমন করে লিখতে পারতেন বিদ্যাসাগর?"

বিদ্যাসাগর তো এমন কথাই লেখেন নি। 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফন্ড', যার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাসাগর। সেখানে নতুন কর্মকর্তারা নিযুক্ত হলে বিদ্যাসাগর উক্ত চিঠি লেখেন কিন্তু মূল চিঠিতে লাইনটি হচ্ছে[৩৪] :

এমন স্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভাগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধী হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।

ইন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরের ভাষা পরিবর্তন করেছেন কি? নিশ্চয়ই তাই, নইলে তার উদ্ধৃত চিঠির অংশটি সূত্র নেই কেন? মূল চিঠিতে 'ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি'র বিন্দুবিসর্গ নেই। বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চাঙ্গের জীবনীগ্রন্থে এমন অসঙ্গতি অনভিপ্রেত। বরং বিদ্যাসাগরের আর এক আধুনিক জীবনীকার বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরকে 'একেশ্বরবাদী' বললেও সঙ্গতভাবেই লিখেছেন : "তাঁর ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নাই।"[৩৫] এই ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মবিশ্বাসকে রাখাই ধর্মনিরপেক্ষতা, যা সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত।

বিদ্যাসাগর সেকুলার। তিনি গোঁড়ামি মুক্ত হিন্দু। তাঁর কাছে সকল ধর্মের মানুষজন আসে যায়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়েছেন যে একজন মুসলমান ফকির, প্রতিবন্ধী প্রায়ই বিদ্যাসাগরকে এসে গান শুনিয়ে যেতেন।[৩৬] গানটির বাণী তিনি তুলে দিয়েছেন, তা পাঠ করে আমাদের মনে হতেই পারে বিদ্যাসাগর মনের মধ্যে মনের মানুষের সন্ধান পছন্দ করতেন। নইলে অখিলদ্দিনের গান বার বার শুনতে চাইবেন কেন? আবার রক্ষণশীল, মৌলবাদী ও পশ্চাদ্‌গামী শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কথোপকথনের মধ্যে এক সেকুলার মনের পরিচয় পাই।[৩৭] ধর্ম নিয়ে হালকা রসিকতা করেন বিদ্যাসাগরের বাঙালি খ্রিস্টান পাদরি সাহেবের সঙ্গে।[৩৮] অথচ মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টান বলে তাঁর স্নেহে বঞ্চিত নন।

উনিশ শতকের সক্রিয় বাঙালি মনীষীদের কথা বলে আমাদের আলোচনা শেষ করি। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই ধর্ম বাদ দিয়ে সমাজচিন্তা ভাবেন নি। ব্যতিক্রম অক্ষয়কুমার দত্ত এবং অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের কর্মপরিধি বিশাল, মনেও তিনি আধুনিক ও সেকুলার।

উল্লেখপঞ্জি :

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিদ্যাসাগর*, স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯০। এই জীবনীর বহু সংস্করণ হয়েছে, প্রকাশকও অনেক।

২। বিহারীলাল সরকার, *বিদ্যাসাগর*, প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক-সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৬। এই গ্রন্থেও নানা সংস্করণ।

৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, *বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস*, বুকল্যান্ড সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬২। বস্তুত বইটি দুটি বইয়ের সমাহার।

৪। বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৬৯।

৫। ইন্দ্র মিত্র, *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২য় সং, ২০০১; প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিদ্যাসাগরচরিত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬৫ সং।

৭। দ্র. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত *রামেন্দ্র রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৫৬।

৮। Sricharan Chakravarti, *Life of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar*; Calcutta, 1896.

৯। Subal Chandra Mitra, *Iswar Chandra Vidyasagar*, New Bengal Press, Calcutta, 1912.

১০। দ্র. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৮ নং।

১১। Sivanath Sastri, *Men I have Seen*, Calcutta, 1919; ক্ষুদিরাম বসু, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', *পঞ্চপুষ্প*, আষাঢ় ১৩৩৬; শশিভূষণ বসু, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', *প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩৪৩; শরৎকুমার লাহিড়ী, 'বিদ্যাসাগর কথা', *প্রবাসী*, ভাদ্র, ১৩১৭; রমেশচন্দ্র দত্ত, 'বিদ্যাসাগর', *নব্যভারত*, ভাদ্র, ১২৯৮; রজনীকান্ত গুপ্ত, *প্রতিভা*; যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'আমার দেখা লোক', *প্রবাসী*, শ্রাবণ, ১৩৪২।

১২। অমিয়কুমার সামন্ত, 'ঈশ্বর, ধর্ম ও বিদ্যাসাগর', দ্র. *প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ১৯৯৪, পৃ: ৯২-১১৪।

১৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ*, নতুন সং, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ: ১২০।

১৪। ওই, পৃ: ২৬৯-২৭০।

১৫। ক্ষুদিরাম বসু, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি', *পঞ্চপুষ্প*, আষাঢ়, ১৩৩৬ সংখ্যা, পৃ: ২৯৫।

১৬। ওই।

১৭। অমিয়কুমার সামন্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃ: ১০৪।

১৮। বিপিনবিহারী গুপ্ত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১২০।

১৯। ওই, পৃ: ২৭৯।

২০। বিহারীলাল সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১২৭।

২১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪৩৭।

২২। ওই, পৃ: ৪৩৬।

২৩। ওই, পৃ: ৪৩৫।

২৪। বিহারীলাল সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২৬৯।

২৫। ওই, পৃ: ৩৪০।

২৬। শ্রীম কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত*, দ্বিতীয় ভাগ, কলকাতা, ১৩৬০ সং, পৃ: ৩৮৫-৩৮৬।

২৭। ওই, তৃতীয় ভাগ, কলকাতা, ১৩৬০ সং দ্রষ্টব্য।

২৮। ওই।

২৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩০। Subal Chandra Mitra, পূর্বোক্ত গ্রন্থ।

৩১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩৮০।

৩২। রামেন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ: ১৯১।

৩৩। দ্রষ্টব্য ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে লেখা তাঁর পত্র। প্রাপক ড: জে. আর. ব্যালান্টাইন। ইনি ছিলেন বেনারসের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি তখন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনে এসেছিলেন।

৩৪। মূল চিঠির প্রয়োজনীয় অংশের জন্য দ্র. বিহারীলাল সরকার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩১৪-৩১৫।

৩৫। বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪৪৪।

৩৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪৩৮-৪৩৯। এখানে পুরো গীতটি উদ্ধৃত আছে।

৩৭। শশিভূষণ বসু, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ৫৪৯।

৩৮। S. N. Sastri, *Op. Cit.*, pp. 27-29.